নবদ্বীপ পরিক্রমা

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

মাত্র দুটো দিন ছুটি—শনি আর রবি। মাসের শেষ। হাতে টাকা-পয়সাও তেমন নেই। কোথাও বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছা হচ্ছে। অনেকদিন কোথাও যাওয়া হয়নি। মনটা ছট্‌ফট্‌ করছে।

চলুন শ্রীধাম নবদ্বীপ ঘুরে আসি।

যেদিন যাবেন, সেদিনই ফিরে আসতে পারবেন। কিন্তু দিনে গিয়ে দিনে ফিরে আসা—ঝটিকা সফর হয়ে যাবে। শহরটা দেখা হবে বটে, কিন্তু মন ভরবে না। এ যেন পঞ্চব্যঞ্জনের রান্না, গিলে খেতে হচ্ছে। পেট ভরছে বটে, কিন্তু আস্বাদনের রসমাধুর্য পাওয়া যাবে না।

বড় পবিত্র স্থান এই নবদ্বীপ। শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীকৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, বাসুদেব সার্বভৌম, বুনো রামনাথ, শ্রীগদাধর ভট্টাচার্য, শ্রীমথুরানাথ প্রমুখ ধুরন্ধর পন্ডিতেরা এখানে জন্মগ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। এখানকার মৃত্তিকা নির্মিত মৃদঙ্গ থেকে হরিবোল ওঠে।

আমার কথায় যদি রাজী হন, নবদ্বীপ যাওয়াই ঠিক করেন, তবে সকাল সাড়ে ছ'টায় হাওড়া থেকে ট্রেন ছাড়ে। নবদ্বীপের একটা টিকিট কেটে কোন একটা কামরায় জানলার ধারে বসে পড়ুন। দেখতে দেখতে সময় কেটে যাবে। এ লাইনে হকারের ভিড় বড্ড বেশী। ভাল মিষ্টি পাওয়া যায়, খেতে পারেন। মনে রাখবেন সমুদ্রগড় এলেই কিন্তু নামার জন্য তৈরী হতে হবে। এরপরই নবদ্বীপ। মধ্যে অবশ্য কালীনগর হল্ট স্টেশন আছে। এই স্টেশনে লোকজন নেই বললেই চলে। লোকে বলে স্টেশনটা হকারদের কামরা পালটানোর জন্যই হয়েছে।

সমুদ্রগড় এসে গেছে। এ-নাম কিভাবে হল জানেন? কিংবদন্তি অনুসারে বহু পূর্বে জোয়ারে সমুদ্রের জল এই পর্যন্ত আসত। কিন্তু জলস্ফীতির রেশ যেত নবদ্বীপ পর্যন্ত। সেই থেকে নাম হয়েছিল সমুদ্রগতি। তারপর কবে কোন কালে সমুদ্রগড় হল সে খবর কেউ জানে না। রসিক সম্প্রদায় অন্য কথা বলে।

আকাশের চাঁদের সঙ্গে সমুদ্রের একটা নিবিড় সখ্যতা আছে। সে সখ্যতা চিরন্তন প্রেম-সূত্রে বাঁধা। তাই চন্দ্রদর্শনে সমুদ্র উদ্বেল হয়ে ওঠে। কুল হারাতে চায়। সেই সমুদ্রের কানে এল নবদ্বীপে এক অভিরূপ চন্দ্রের উদয় হয়েছে। তার সমুজ্জ্বল প্রভায় ধরণী আলোকোদ্ভাসিত হয়ে গেছে। আকাশের চাঁদও নিঃস্প্রভ হয়ে হার মেনেছে তার কাছে।

তাকে চোখে দেখার বাসনা জাগল সমুদ্রের অন্তরে। সে এল দেখতে। নবদ্বীপ পর্যন্ত সে গেল না। কারণ উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে তাকে পাওয়া যাবে না। তাকে পেতে হবে শান্ত

সৌম্য স্নিগ্ধতার মধ্য দিয়ে। তাকে দেখতে হবে প্রশান্ত নয়নের স্নিগ্ধ আলোকদ্যুতিতে। তাই প্রবল উচ্ছ্বাস নিয়ে সে গেল না। একটি ক্ষুদ্র জলস্রোত হয়ে সে এল দেখতে। নব জলধারায় অভিষেক হল নবদ্বীপচন্দ্রের। নবোদিত চন্দ্রিমার অপরূপ রূপ দর্শনে সমস্ত অন্তর তৃপ্ত হল তার। রসিকের ভাবুক দৃষ্টিতে ভাবের বিষমতা ঘটে থাকে।

আর গল্প শুনলে চলবে না। ট্রেন নবদ্বীপধামে ঢুকছে। আপনি ধাম স্টেশনে না নেমে পরের স্টেশন বিষ্ণুপ্রিয়ায় নামুন। সুবিধা হবে। স্টেশনটা নবদ্বীপ শহরের অনেকটা কাছে। অনেক রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে। বেশী ভাড়া চাইলে হাঁটতে শুরু করুন। ভালই লাগবে পথ চলতে।

পুবমুখো রাস্তা দিয়ে চলতে শুরু করুন। কিছুটা হাঁটলেই বাঁ পাশে চোখে পড়বে একটা প্রাচীন বটগাছ। কিছুদিন আগেও ঐ গাছটা তার শাখা-প্রশাখা দিয়ে পাশের জীর্ণ মন্দিরটাকে আগলে রেখেছিল। ভগ্ন মন্দিরটা সারানোর সময় গাছের বড় ডালগুলো ছেঁটে ফেলা হয়েছে।

কাছে এলেই নবকলেবরে শোভিত মন্দিরটা চোখে পড়বে। ওটাই পোড়ার মার মন্দির। ভেতরে পঞ্চমুন্ডীর আসন। তার উপরেই মায়ের অধিষ্ঠান। এখানে প্রণাম সেরে ঐ পথেই আর কিছুটা এগোলে আর একটা মন্দির চোখে পড়বে। ওটাও কালীমন্দির। নাম ওলাদেবী। লোকে বলে এখানে এক সময় ওলাওঠা ভয়াবহ মহামারীর আকার ধারণ করেছিল। শয়ে শয়ে লোক মারা যাচ্ছে। অসহায় মানুষ আকাশের দিকে চেয়ে ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করছে। এমন সময় একদিন দৈববাণী হল—বিপত্তারিণীর পুজো করলেই বিপদ কেটে যাবে। যিনি দিগ্বসনা, যিনি শিবের ওপর নৃত্য করছেন, তিনিই তো বিপত্তারিণী। তিনি পারেন জীবকে আধিভৌতিক দুঃখ থেকে মুক্ত করতে। সমারোহে পুজো করে সে যাত্রায় শহরবাসী বিপদ থেকে মুক্ত হল। সেই থেকে তাঁর নাম হল ওলাদেবী।

মন্দির থেকে বেরিয়ে হরিসভা পাড়ার মধ্য দিয়ে পূবদিকে আর একটু হাঁটলেই আপনি পোড়ামাতলায় পৌঁছে যাবেন। ওখানেই পোড়ামার মন্দির। নবদ্বীপের প্রাণকেন্দ্র। আশেপাশের গ্রাম থেকে প্রতিদিন বহু লোকের আনাগোনা হয়। অনেক দোকানপাট। রিক্সার ভিড়, এরপর আছে তীর্থযাত্রীর যাতায়াত। সারাটা দিন স্থানটা সরগরম হয়েই আছে।

এখানকার স্থানমাহাত্ম্য দিনের বেলায় ঠিকভাবে উপলব্ধি করা যাবে না। সেটা বুঝতে হলে মধ্যরাত্রে আসতে হবে। লোকে বলে মা নাকি তখন প্রকট হন। পরিবেশ তখন আমূল পাল্টে যায়। শ্মশানের নিঃস্তব্ধতা তখন আপনার মনে ভীতির সঞ্চার করবে।

জনশ্রুতি আছে, বহুকাল পূর্বে এখানে কোন এক সাধকের সাধনায় সন্তুষ্ট জননী তাকে কথা দিয়েছিলেন যে দিনের দু'দন্ডকাল তিনি এখানে প্রকট হবেন। সেই আশায় বুক বেঁধে আজও শত শত যাত্রী আকুল হয়ে এখানে মাথা খুঁড়ে মরে—কবে তাঁর দর্শন হবে।

একটা মজার জিনিস লক্ষ্য করেছেন? যে-কোন দোকানের সাইনবোর্ড লক্ষ্য করুন,

লেখা আছে নবদ্বীপ নদীয়া। জেলা বিভাগে নবদ্বীপ বর্ধমানেরই অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিৎ ছিল। নবদ্বীপের আগের স্টেশন কালীনগর এবং পরের স্টেশন বিষ্ণুপ্রিয়া—দুটোই বর্ধমান জেলার অন্তর্গত। নবদ্বীপকে বর্ধমান জেলা থেকে ছিনিয়ে নদীয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এটা কে করেছেন জানেন? নদীয়ার মহারাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। নিজ রাজত্বের গৌরব বৃদ্ধির জন্য নবদ্বীপকে নদীয়ার অন্তর্ভুক্ত করিয়েছিলেন। এর জন্য তাঁকে প্রচুর আর্থিক খেসারৎ দিতে হয়েছিল।

যাইহোক, সামনের বটগাছটার দিকে তাকান। মনে হবে বৃদ্ধ বটগাছটা তার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা দিয়ে স্থানটিকে আগলে রেখেছে। গাছটার বয়স হবে প্রায় ছ'সাতশো বছর। সামনেই একটা বড় মাপের হাঁড়িকাঠ পোঁতা আছে। পর্বদিনে বলি হয়। গাছটার গোড়াতেই চোখে পড়বে একটা ছোট দরজা। ভেতরটা অন্ধকার। ফুলে ফুলে ঢাকা। ওখানেই মায়ের অধিষ্ঠান। ওর ভেতরেই পুজো হয়। তীর্থযাত্রীদের অনেকেরই ধারণা যে ঐ বটগাছটাই দেবতা। গাছের গোড়াটা সিঁদুর লেপা। আর গাছঘেরা অসংখ্য মালা ঝুলছে গাছের গায়ে। প্রতিদিন অসংখ্য যাত্রী আসে, মানত করে গাছঘেরা মালা দিয়ে যায়। গাছঘেরা মালা দেওয়াটাই এখানকার রীতি। মন্দিরের বাইরে ফুলের বড় বড় ডালা নিয়ে মালাকারেরা বসে আছে। এই মালা বেচেই কতগুলো সংসার চলে। যে পোড়ামাকে নিয়ে এই বিশাল ব্যবসা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে, তার ইতিহাস জানেন?

আজ থেকে প্রায় সাড়ে ছ'শো বছর আগের কথা। বিশিষ্ট বৈদান্তিক শ্রীবাসুদেব সার্বভৌমের বয়স তখন পনেরো কি ষোলো হবে। আকাট মূর্খ। সারাটা দিন কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়। বাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ শুধু খাওয়া আর শোওয়ার। এমন সময় একদিন বাসুদেবের পিতার ব্রাহ্মণবিদায়ের নিমন্ত্রণ এল রাণাঘাট থেকে। কিন্তু তিনি যাবেন কী করে? বাড়ীতে টোল আছে, ছাত্রেরা প্রতিদিন পড়তে আসে। তাদের পড়াবে কে? গৃহদেবতা আছেন—এসব ফেলে তিনি যাবেন কী করে? বাড়িতে বাসুদেব আছে। সে তো মূর্খ। বর্ণপরিচয় পর্যন্ত হয়নি। ব্রাহ্মণের ছেলে, সামান্য পুজো পর্যন্ত জানে না। পুত্রের প্রতি বিতৃষ্ণায় মনটা ভরে উঠল তাঁর। মনে হল অমন ছেলে থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। স্ত্রীকে ডেকে বললেন, অমন ছেলের মুখে ছাই দিতে পারো না? আজ দুপুরে ওর পাতে ছাই দিও।

স্বামীর কঠোর আদেশ, অমান্য করা যায় না। কিন্তু তিনি তো মা। দশমাস গর্ভে ধারণ করেছেন। তাঁর পক্ষে ছাই দেওয়া কি সম্ভব?

মহা সমস্যায় পড়লেন বাসুদেবজননী। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর একটা সমাধান খুঁজে পেলেন। থালায় ভাত দিয়ে পাশে একটু ছাই দিয়ে দিলেন। ছেলে জিজ্ঞেস করলে একটা কিছু বলে দেবেন।

এভাবে সমস্যার সমাধান হল না। খেতে বসে প্রথমেই চোখ পড়ল ছাই-তে। অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত ক্রোধবহ্নি মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে উঠল বাসুদেবের। ক্রুদ্ধকণ্ঠে এর কারণ

জিজ্ঞাসা করতেই ঘাবড়ে গেলেন জননী। সব ঘটনা বলে দিলেন তাকে। কোন প্রতিবাদ না করে নিঃশব্দে সব কথাই শুনল বাসুদেব। নিজের অকর্ম্মণ্যতার কথা ভেবে মনটা বিষাদে ভরে গেল। গলা দিয়ে আর ভাত নামছে না। খানিক নিঃশ্চুপ থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

না, এ জীবন সে আর রাখবে না। গঙ্গায় আজই প্রাণবিসর্জন দেবে। গঙ্গার তীরে বালির চড়ায় হেঁটে চলেছে বাসুদেব। পথের দু'পাশে হোগলার ঘন জঙ্গলে কে যেন আগুন দিয়েছে। ছাই-এর গাদা জমেছে। হঠাৎ একটা নারীকণ্ঠ ভেসে এল—প্রাণ বিসর্জন দি্স না। আমায় প্রতিষ্ঠা করলেই তোর সকল কামনা বাসনা পূর্ণ হবে।

এমন মধুর ভুবনমনোহর কণ্ঠ সে তো এর আগে আর কোনদিন শোনে নি। সে চারিদিকে ভাল করে চেয়ে দেখল। কোথাও কাউকে দেখতে পেল না। সে আবার পথ চলতে শুরু করল। আবার সেই মধুর কণ্ঠস্বর কানে এল। সেই এক কথা—আমায় প্রতিষ্ঠা কর, আমি এখানে পড়ে আছি। বাসুদেবের মনে হল কথাগুলো ছাই-এর গাদা থেকে আসছে। এবার সে পাগলের মত ছুটে গেল সেই দিকে। দু'হাতে ছাই সরাতেই চোখে পড়ল একটা বড় পাথর। মনে হল নারীকণ্ঠটা ওখান থেকেই আসছে।

গঙ্গায় আর প্রাণ বিসর্জন দেওয়া হল না। সযত্নে অতি আদরের সঙ্গে পাথরটা বাড়ি নিয়ে এলেন। প্রতিষ্ঠা করলেন বাড়ির পাশে একটা বটগাছের তলে। ভক্তিভরে নিত্য পুজো আরম্ভ হল। দেবতার অসীম করুণায় বাসুদেব হলেন বাসুদেব সার্বভৌম। বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী বৈদান্তিক। পরবর্তীকালে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বারা প্রভাবিত হন।

আর বাসুদেবের ইষ্টদেবতা ঐ প্রস্তরখন্ডটিই পরিচিতা হলেন পোড়ামা রূপে। কেউ বলে পুড়ে যাওয়া বন থেকে পাওয়া গিয়েছিল বলে দেবতার নাম পোড়ামা। আবার কারো মতে পড়ুয়া মা থেকে পোড়ামা হয়েছে।

পরেরটাই মনে হয় ঠিক। তার কারণ এই পোড়ামার আর এক নাম বিবুধজননী বা বিদগ্ধজননী। ইতি কালী নন। দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয়া। নীল সরস্বতী।

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগের কথা বলছি। তখন এ স্থান ছিল নিবিড় নির্জন। সারাদিনে যে কজন লোক এখানে আসত তারা বেলা থাকতে। এসে প্রণাম সেরে বাড়ি ফিরে যেত।

এ সময় প্রতিদিন বিকেলে প্রসিদ্ধ পন্ডিতেরা এখানে আসতেন, বিভিন্ন শাস্ত্রের চর্চা হত। তারপর সন্ধ্যায় দেবতার সন্ধ্যারতি দেখে বাড়ি ফিরে যেতেন। তখন বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রস্থল ছিল এই নবদ্বীপ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্রেরা পড়তে আসত এখানে। কত টোল ছিল। দিকপাল পন্ডিতেরা পড়াতেন। অধ্যয়ন অধ্যাপনার ক্ষেত্রে তখন নবদ্বীপের স্থান ছিল একেবারে প্রথমে। তখন নবদ্বীপকে বলা হত অক্সফোর্ড অফ্ বেঙ্গল। তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ—সে সব দিন চলে গেছে। বাদ দিন ওসব পুরোনো দিনের গল্পকথা।

না, বাদ দিলে চলবে না। পুরাতনকে ভিত্তি করেই তো বর্তমানের অস্তিত্ব। পুরাতনকে অস্বীকার করে শুধু বর্তমান স্বীকার করলে জ্ঞান ভগ্নাংশে পরিণত হবে। মানুষ দিন দিন বড় স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য যতটুকু জ্ঞান তার দরকার, সেটুকুই তার পক্ষে যথেষ্ট। পিছন পানে তাকানোর সময় কোথায়?

পোড়ামা দর্শনের পর বাঁ-পাশের মন্দিরে যাই। বিশাল শিবলিঙ্গ। নাম ভবতারণ। মৃত্যুকালে ইনিই তো জীবের ডান কানে তারকব্রহ্ম নাম শুনিয়ে জীবকে ভববন্ধন থেকে মুক্ত করেন।

পোড়ামার ডানপাশে যে মন্দিরটা দেখছেন, ওটা ভবতারিণীর মন্দির। মূর্তিটার দিকে তাকান, অদ্ভুত না! বিশাল দেহ নিয়ে শিবের ওপর বসে আছেন। কালীমূর্তি এমন হল কেন জানেন? এর ইতিহাসটা বলি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মনে নিভৃত একটা বাসনা ছিল। পোড়ামার একদিকে হবে শিবমন্দির আর অন্যদিকে থাকবেন সকল বিঘ্নবিনাশক বিনায়ক।

রাজার আদেশে মূর্তি তৈরী শুরু হল। পাথরের মূর্তি। মূর্তি তৈরী যখন প্রায় শেষের দিকে, সেই সময় একটা অঘটন হল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্নাদেশ পেলেন। গণেশ নয়, কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা কর, নাম হবে ভবতারিণী। ঐ গণেশ মূর্তিকেই কিছুটা অদলবদল করে কালীমূর্তিতে পরিণত করা হল। কিন্তু মুস্কিল হল শিব তৈরীর সময়। জায়গা কোথায়? অবশেষে গণেশের আসনটাকেই কেটে কুটে শিব বানানো হল। মন্দিরটা লক্ষ্য করে দেখুন। বিশাল বটগাছটা তার ডাল পালা দিয়ে মন্দিরটাকে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে যে মন্দিরের অস্তিত্বই বিলুপ্তপ্রায়।

পোড়ামা দর্শন হয়ে গেল। চলুন এবার নবদ্বীপচন্দ্রকে দেখে আসি। নবদ্বীপে এলেন, নবদ্বীপচন্দ্রকে দেখবেন না? পোড়ামার মন্দির থেকে বেরিয়ে সোজা উত্তরে কিছুটা হেঁটে বাঁ পাশের গলিটায় ঢুকে পড়ুন। একটু এগোলেই নবদ্বীপচন্দ্রের মন্দির।

মণিপুরবাসীরা শ্রীচৈতন্যদেবকে নবদ্বীপচন্দ্র বলে। প্রতি বছর লাক্সারী বাসে সুদূর মণিপুর থেকে ওরা আসে নবদ্বীপচন্দ্রকে দর্শন করতে। নানা জিনিস উপহার দিয়ে যায় তাঁকে। কেউ দেয় সুদৃশ্য বেনারসী, কেউ তসর, কেউ বা সোনার পৈতে।

এ মন্দিরে বিগ্রহের সেবার জন্য যত সেবাইৎ আছেন, তাঁরা সকলেই বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতৃকুলের। দরজার সামনেই সেবাইৎ কাঠের বাক্স নিয়ে বসে আছেন। তিনি তীর্থযাত্রীর কাছ থেকে ভেট নিয়ে বিগ্রহ দর্শনের অনুমতি দেন। এখানকার এই প্রথা। বিগ্রহদর্শন করতে টাকা দিতে হবে। তবে এ রীতি কিন্তু সব মন্দিরে নয়। আপনি গানতলায় শ্রীভুবনেশ্বর সাধু প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোবিন্দের মন্দিরে যান, অথবা সমাজবাড়িতে যান, সেখানে ভেট দিতে হবে না। এই সমাজবাড়িতেই চরণদাস, রামদাস বাবাজীর মত মহাবৈষ্ণবেরা সিদ্ধিলাভ করে গেছেন। এ সকল স্থানের পরিবেশ-মাহাত্ম্য ভক্তকে বাধ্য করবে হৃদয়ের সকল সম্পদ উজাড় করে দিতে।

সেবাইৎকে ভেট দিয়ে নাটমন্দিরে এসে দাঁড়ান। ভাল করে মূর্তির দিকে তাকান।

দেখার মত দু'চোখ দিয়ে দেখুন। কী অপূর্ব ভুবন ভোলানো মুখখানা। আকর্ণবিস্তৃত চোখ, মনে হচ্ছে যেন চোখ দিয়ে হাসছেন।

একবার বৃন্দাবন থেকে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব চট্‌বাবা এসেছিলেন মূর্তি দর্শন করতে। সৌভাগ্যবশতঃ আমি সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। অত্যন্ত নিকট থেকেই আমি তাঁকে দেখেছি। চট্‌বাবা এলেন। পরনে একটা চট্ আর উত্তরীয় একটা। গলায় গোটা দশেক ছোট বড় তুলসীর মালা। আধ ঘণ্টা ধরে মূর্তির দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলেন। রোমাঞ্চিত শরীর মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। চোখের উদ্‌গত অশ্রুধারায় বুক ভিজে গেছে। তারপর এক সময় মন্দির থেকে বেরিয়ে গেলেন। প্রণাম করলেন না? খটকা লাগল আমার মনে। তার পরই মনে হল ঠিকই আছে। নদী যখন সমুদ্রের সঙ্গে মিশে যায় তখন নদী আর সমুদ্রে কোন পার্থক্যই থাকে না। একাকার হয়ে যায়। এও ঠিক তা-ই। সাধক যখন সাধ্যসাযুজ্য লাভ করে, তখন সাধ্যসাধকে কোন ভেদ থাকে না। কে কাকে প্রণাম করবে? তখন সাধকের তুরীয় অবস্থা। তখন সাধক পরমানন্দে বলে উঠবে—'নমস্তুভ্যং নমো মহ্যং ডুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ'। তখনকার অবস্থা বর্ণনার অতীত।

এই বিগ্রহের একটা বিচিত্র ইতিহাস আছে। শ্রীক্ষেত্র পরিক্রমার শেষে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ শান্তিপুরে এসেছেন। পতিসন্দর্শনের উদগ্র বাসনা জেগেছে বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরে। তিনি গৃহভৃত্য ঈশ্বরকে পাঠালেন শান্তিপুরে। বললেন, তাঁকে বলতে যে মা তাঁর সন্তানকে একবার দেখতে চেয়েছেন। মায়ের ডাক অস্বীকার করতে পারলেন না শ্রীশচীনন্দন। চলে এলেন শ্রীধামে।

ভক্তসমাগম আর কীর্তনের মধ্য দিয়ে কেটে গেল কয়েকটা দিন। একদিনের ঘটনা—সেদিন নামকীর্তনের পর সবাই চলে গেছে। শ্রীচৈতন্যদেব ঘরে এসে বসলেন। একটু বিশ্রাম করবেন, এমন সময় বিষ্ণুপ্রিয়া ঘরে ঢুকে তাঁর পায়ের কাছে বসলেন। অন্তরে তাঁর অনন্ত বাসনা। করুণ মিনতিভরা গলায় বললেন—প্রভু তোমার কাছে যে যা চায়, তুমি তাকে তাই দাও। আমাকে তো কোনদিন কিছু দিলে না? বিষ্ণুপ্রিয়ার সে কথা শুনে বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের মন গলে গেল। সত্যই তো, কোনদিন তো কিছু দেন নি তাঁকে। অনুশোচনায় মন ভরে গেল তাঁর। সস্নেহে বিষ্ণুপ্রিয়ার মাথায় হাত রেখে বললেন, বল কী চাই তোমার?

স্বামীর মুখ থেকে সে কথা শুনে বিষ্ণুপ্রিয়ার মরা গাঙে আনন্দের জোয়ার জেগেছে। এবার তিনি তাঁর অন্তরের নিভৃত বাসনাটা জানাবেন। সে সুযোগ এসেছে। বিনম্রচিত্তে বিষ্ণুপ্রিয়া বললেন, আমি সর্বদা তোমার সঙ্গে থাকতে চাই। আর কিছুই চাই না।

স্ত্রীর সে আবেদন শুনে এক মুহূর্ত নিঃশ্চুপ থেকে প্রিয়াবল্লভ উত্তর দিলেন—বেশ তাই হবে। তারপর একটু হেসে বললেন, আমার একটা মূর্তি তৈরি কর। যখনই তোমার ইচ্ছে হবে তখনই ঐ মূর্তির মধ্যে আমাকে দেখতে পাবে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার নির্দেশে কারিগর এল। নিম কাঠের যে মূর্তি তৈরি হল, তা গৃহস্থাশ্রমের।

বানপ্রস্থ সন্ন্যাসের নয়। যার চোখ নেই, সে ঐ নিমকাঠের মূর্তিই দেখবে। আর যে মন দিয়ে দেখবে, সে ঐ দারুর মধ্যেই দেখবে দারুব্রহ্মকে। বস্তু এক হলেও গ্রাহক ভেদে বস্তুসত্তার ভিন্নতা ঘটে থাকে।

চলুন, এবার আমরা আগমেশ্বরী মন্দিরে যাব। তন্ত্রবিশারদ শ্রীকৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তন্ত্রসাধনায় এখানে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। আজকাল আমরা যে কালীমূর্তি দেখি, সেটা তাঁরই কল্পনাপ্রসূত। এর আগে ধ্যানেই কালীপুজো হত।

সাধকের কল্পনা বড় অদ্ভুত। শিবের ওপর শিবপ্রিয়ার অধিষ্ঠান। মহাকালের উপর খন্ডকালের নৃত্য। পাশ্চাত্যে একেই 'গ্লোবাল' এবং 'লোকাল' বলা হয়। মহাকাল অখন্ড। অতীত নেই, বর্তমান নেই, ভবিষ্যতও নেই। নির্গুণ নিরাকার। সেই মহাকালকে খন্ডকল্পনা করেই তো কালাত্মিকা শক্তি কালী সেজেছেন। তিনি দিগ্বসনা, দিগম্বরী। আলুলায়িত কেশ, বামে উদ্যত খড়্গ আর নরমুন্ড। দক্ষিণে বরাভয়। গলায় নরমুন্ডমালা। সাংখ্যদর্শনের পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব। পুরুষ চেতন কিন্তু নিষ্ক্রিয়। অপরদিকে প্রকৃতি অচেতন, কিন্তু সক্রিয়। চেতনের সংস্পর্শে প্রকৃতি চৈতন্যবিলাসিতা হয়ে সৃজনোন্মুখী হয়ে ওঠে। সৃষ্টি ও লয়ের এক অপূর্ব সামঞ্জস্য।

চলুন এবার আমরা সমাজবাড়ির দিকে পা বাড়াই। অনেকক্ষণ হেঁটেছেন। পা ব্যথা করছে তো? এবার একটা রিক্সা ভাড়া করুন। বেশিক্ষণ লাগবে না। সমাজবাড়ি এসে গেছে। ভেতরে ঢুকলেই বুঝতে পারবেন পরিবেশটা অনেকটা আশ্রমের মত। বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি দিয়ে সাজানো। এখানে চরণদাস বাবাজী, রামদাস বাবাজী, ললিতাসখীর মত মহাপুরুষেরা সিদ্ধিলাভ করে গেছেন। ললিতাসখী প্রসঙ্গে একটু না বললে বৈষ্ণব অপরাধ হবে। তাঁর সাধনা ছিল সখীভাবে। তাই সখীর মতই সেজে থাকতেন। চোখে কাজল, কানে দুল, নাকে নথ, হাতে চুড়ি, পায়ে আলতা—একেবারে নারীমূর্তি। ইষ্টদেব ছিলেন নাগর কৃষ্ণ পুরুষোত্তম। তিনিই নাগর আর ইনি তাঁর সখী। প্রতি বছর বৈশাখ মাসে চন্দনযাত্রার রাত্রে রাধামাধবকে নিয়ে যেতেন নৌকাবিহারে। সারারাত নৌকোতেই কাটত। নৌকাবিলাসের পদাবলী কীর্তন হত সারা রাত। তারপর রাধামাধবকে নিয়ে আসতেন পোড়ামা মন্দিরে। উদাত্ত কণ্ঠে গান ধরতেন। সে গান ছিল সম্পূর্ণ ভাবের। গানের মধ্য দিয়ে মাকে মিনতি জানিয়ে বলতেন—হে জগজ্জননী, আমার রাধামাধবের মিলন হয়েছে কাল রাত্রে। তুমি আশীর্বাদ কর ওদের মিলন যেন সার্থক হয়। ওরা যেন চিরদিন সুখে থাকে।

বস্তু দিয়ে বিচার করলে এর কোন অর্থই হয় না। কিন্তু ভাবজগতে এর বিশাল ব্যঞ্জনা। ভাব থেকেই বস্তুর প্রকাশ। বস্তুর অনুভূতি চোখে আর ভাবের অভিব্যক্তি মনে।

প্রসঙ্গটা যখন উঠলই, তখন আর একজন বৈষ্ণবের কথা বলি। তিনি হলেন বংশীদাস বাবাজী। তিনি থাকতেন গঙ্গার চরে একটা ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে। বালগোপাল ছিলেন তাঁর ইষ্টদেবতা। তাঁর সাধনায় ছিল বাৎসল্য ভাব। প্রতিদিন দ্বি-প্রহরে মাধুকরীতে বেরোতেন।

যা কিছু জুটত তাই নিয়ে ফেরার পথে যেতেন ঈশ্বর পোদ্দারের দোকানে। সেখান থেকে একটা রসগোল্লা নিয়ে কুটিরে ফিরতেন। রসগোল্লাটা গোপালকে দিয়ে বলতেন—খাও, আমি গঙ্গা থেকে জল এনে দি। রাতে গোপাল বিছানায় অপকর্ম করত, সকালে তার বিছানা রোদ্দুরে দিতেন।

হরিবোল কুটিরের আর এক বৈষ্ণবের কথা বলি। তিনি নিজেকে হরির দাসানুদাস ভাবতেন। তাই তাঁর নাম ছিল হরিদাসদাস। সারাটা দিন সাধন-ভজনেই কেটে যেত। মধ্যরাত্রে বেরোতেন নগর সংকীর্তনে। হাতে খঞ্জনি আর মুখে উদাত্ত কণ্ঠে হরিনাম। সে হরিনামে কি যাদু ছিল জানি না, রাস্তার কুকুরগুলো পর্যন্ত অভিভূত হয়ে যেত। করুণ স্বরে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পেছন পেছন যেত।

এমনই হয়। আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত প্রতিটি জীবই সেই পূর্ণানন্দ আস্বাদনের জন্য লোলুপ হয়ে আছে। প্রতিটি জীবের অন্তরেই সেই পূর্ণানন্দ মাঝে মাঝে চমক দেয়। চেতন হোক আর অচেতনই হোক, প্রতিটি জীবের মধ্যেই অজপা মন্ত্রের অনুরণন হচ্ছে। কেউ অনুভব করতে পারে,কেউ পারে না। সবেতেই ভাবের খেলা—ভাবেই অনুভব।

নবদ্বীপ পরিক্রমা প্রায় শেষের মুখে এসে গেছে। চলুন রাণীরঘাট দর্শন করেই ফিরে যাব। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের স্ত্রী পর্বদিনে নবদ্বীপে আসতেন। গঙ্গায় স্নান সেরে ঘাটে সাধ্যমত দান করতেন। আবালবৃদ্ধবনিতার ভিড় হত সেখানে। সেই থেকে রাণীর ঘাট নাম হয়েছে।

এখন রাণীর ঘাটের যে রূপ দেখছেন, তখন এসব কিছুই ছিল না। চৈতন্যদেবের মন্দির, শিবমন্দির—এসব এই সেদিন হল। তখন এখানে ছিল এক বিশাল বটগাছ। প্রায় দুশো বছরের তরুণ সেই বটবৃক্ষ তার শাখা-প্রশাখা দিয়ে আগলে রেখেছিল এই ঘাটকে। নবদ্বীপের ইতিহাসের বহু উত্থান-পতনের সাক্ষী ছিল। গঙ্গার স্রোতে তলার মাটি ক্ষয়ে যাওয়ায় শিকড়গুলো আলগা হয়ে গিয়েছিল। তারপর ১৯৭৮-এর ভয়াবহ বন্যায় সবার অলক্ষ্যে প্রবল স্রোত তাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল কেউ জানে না।

সেবার গঙ্গাপুজোতে কৃষ্ণনগর থেকে রাণী স্নান করতে নবদ্বীপে এসেছেন। স্নান সেরে দান করার সময় রাণীর চোখ পড়ল এক মহিলার দিকে। পরণে শতচ্ছিন্ন শাড়ী, শাঁখার অভাবে দু'হাতে লাল সুতো বাঁধা। এত দারিদ্র সত্ত্বেও তিনি দান গ্রহণ করছেন না দেখে রাণী একটু অবাকই হলেন। তিনি মহিলাটিকে দান গ্রহণ না করার কারণ জিজ্ঞেস করতে মহিলাটি উত্তর দিলেন—রাণীমা, তোমার হাত শাঁখাশূন্য হলে বাংলার কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু আমার হাতের এই লাল সুতো খুলে গেলে সারা বাংলা অন্ধকার হয়ে যাবে।

মহিলার কথা শুনে রাণী হতবাক হয়ে গেছেন। কে এই মহিলা? ফিরে গিয়ে রাজাকে সকল ঘটনা জানাতে মহিলার স্বামীকে দেখার প্রবল কৌতুহল জাগল রাজার মনে। একদিন রাজা এলেন তাঁকে দেখতে। ইনি বুনোরামনাথ। বাংলা তথা ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নৈয়ায়িক। বাড়িতেই টোল ছিল তাঁর। সেখানেই ছাত্রেরা পড়তে আসত। আর অন্য সময় বাড়িতে পোঁতা ঘন তুলসীবনে বসে তাদের ন্যায়দর্শন শিক্ষা দিতেন।

এমন সময় একদিন কৃষ্ণচন্দ্র রাজা এলেন তাঁকে দর্শন করতে। কথাপ্রসঙ্গে সাংসারিক সমস্যার কথা তুলতেই নির্বিকারভাবে উত্তর দিলেন রামনাথ—সংসারে কোন সমস্যাই নেই। সামনে বিশাল তেঁতুলগাছটা দেখিয়ে বললেন, ঐ তেঁতুলপাতার ঝোল আর ভাত। পরমানন্দেই উদরপূর্তি হয়ে যায়। সেকথা শুনে রাজা তাঁকে কিছু জমি দান করেছিলেন।

এতক্ষণ নবদ্বীপের যে পরিচয় দিলাম, সেটা তার বহিরঙ্গ। এর একটা অন্তরঙ্গ পরিচয়ও আছে। তার খবর কিছুটা না দিলে পরিক্রমা পূর্ণ হবে না।

নবদ্বীপে যে সময় বৈষ্ণবশিরোমণি শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন, ঠিক সেই সময়েই এই নবদ্বীপেই আবির্ভাব হয়েছিল তন্ত্রবিশারদ শ্রীকৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের। একদিকে শাক্ত সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়, আর অন্যদিকে বৈষ্ণব ধর্মের প্লাবন। সে জোয়ারের প্রবল টানে ভেসে গেছেন বাসুদেব সার্বভৌম, প্রবোধানন্দ সরস্বতীর মত প্রখ্যাত বৈদান্তিকেরা।

এই শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের যে মহামিলন এখানে ঘটেছে তারই পূর্ণ প্রকাশ আমরা দেখতে পাই এখানকার রাসযাত্রা উৎসবে। বিষ্ণুর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশযাত্রার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল রাসযাত্রা উৎসব। এটি সম্পূর্ণভাবেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উৎসব। মজার কথা হল যে, এই রাসযাত্রায় নবদ্বীপে যে উৎসব হয় সেটা সম্পূর্ণভাবে শাক্ত সম্প্রদায়ের। সে উৎসবে মূর্তি হয় কালী, তারা, ছিন্নমস্তা, ভুবনেশ্বরী, কমলা, মহিষমর্দ্দিনী, শিবদুর্গা প্রভৃতি দেবদেবীর। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ আসে এই উৎসবে। শাক্ত বৈষ্ণবের নিভৃত মিলন।

এই নিভৃত ও নিবিড় মিলন লীলা আর একটা হয়েছে। কোথায় জানেন? বলছি শুনুন। বিষ্ণুপ্রিয়ার আদেশে তৈরি শ্রীগৌরাঙ্গের যে মূর্তিটা আপনি দেখলেন, সেটা আর একবার মনে করুন। নদীয়াবিহারী শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরে রসঘন মূর্তি রাসবিহারী আর বাইরে কান্তাশিরোমণি রাসেশ্বরী। রসিক সম্প্রদায় বলেন, এটি বিপ্রলম্ভ সম্ভোগাত্মক নিরবচ্ছিন্ন প্রেমানন্দ। একাধারে বিরহমিলন লীলা। বাইরে প্রত্যক্ষ বিরহ আর অন্তরে গোপন মিলনবিলাস। এই গোপন মিলনলীলা বিলাসের গুপ্ত প্রকাশ ঘটেছে শ্রীধাম নবদ্বীপে। বৃন্দাবন ধামের মিলনে এত ব্যাপকভাবে মর্তজনের অধিকার হয় নি। কিন্তু করুণাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ নিজে আস্বাদন করে মর্তজনের দ্বারে দ্বারে জানিয়ে দিলেন সে রসমাধুরী। শ্রীচৈতন্যের স্বরূপে শ্রীরাধামাধবের যে নিবিড় মিলন, তা শ্রীবৃন্দাবনের মিলনের মত বহিঃপ্রকাশিত নয়। বাইরে বিরহের আবরণে অন্তরে অন্তরতম প্রিয়তমের মিলন এই নবদ্বীপেই হয়েছে। এ মিলন নিবিড় নিগূঢ় ও গুপ্ত। এই গুপ্ত মিলনের লীলা নিকেতন বলেই রসিক সম্প্রদায় এই নবদ্বীপকে গুপ্ত বৃন্দাবন বলে থাকেন।